ডিজিটাল বাংলাদেশকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা

মোস্তাফা জব্বার

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধদেরকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। প্রত্যাশা, এই বছরে আমরা সবাই আরও একটু ভালো থাকব। এমন একটি স্বপ্ন দেখার সময় আমাদেরকে মনের অজ্ঞাতেই একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রধানত বিগত বছরের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা এসব নিয়েই বেশি পর্যালোচনা হয়ে থাকে। তবে আমাদের দৃষ্টি প্রধানত তথ্যপ্রযুক্তিকে ঘিরে। কারণ, আমরা মনে করি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রধান হাতিয়ারটি হলো তথ্যপ্রযুক্তি। তবে উল্লেখ করা জরুরি, তথ্যপ্রযুক্তির পুরো এক বছরের সফলতা বা ব্যর্থতার আলোচনা বা পর্যালোচনা ছোট একটি নিবন্ধে করা সম্ভব নয়। আমরা সেজন্য কয়েকটি বড় মাপের বিষয়কে বেছে নিচ্ছি। প্রথমেই দেখা যাক পেছনের একটি বছরে আমাদের সফলতা কতটা। খুব মোটা দাগের কিছু সফলতার কথা আমি শুরুতেই উল্লেখ করতে চাই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলতার পাশাপাশি ব্যর্থতার বিষয়টিও আলোচনায় আসবে।

ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ : বছরের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক তার ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ চালু করেছে। এতে ডাচ-বাংলা, পূবালী ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক যোগ দিয়েছে। আশা করা যায়, সব ব্যাংকই এতে যোগ দেবে এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল কমার্সের যুগ নতুন মাত্রা পাবে। ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে একটি বিশাল অর্জন। বর্তমান সরকারের আমলে ই-কমার্সের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও মোবাইল ব্যাংক চালু করার ফলে আমাদের ডিজিটাল যুগে যাত্রা যেভাবে উন্মুক্ত হয়েছে, তাতে এটি আরও একটি বড় সংযোজন। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের সব ব্যাংক একটি নেটওয়ার্কে আসার পাশাপাশি লেনদেনকারী সবার পক্ষে দেশজুড়ে বিদ্যমান সব এটিএম ব্যবহার করা সম্ভব হবে। যেকেউ যেকোনো ব্যাংকের সাথে যেকোনো স্থান থেকে লেনদেন করতে পারবেন। এর ফলে ভিসা-মাস্টারকার্ড জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈদেশিক মুদ্রায় ফি দেয়ার বিষয়টিও সীমিত হয়ে যাবে।

থ্রিজির পাইলট প্রকল্প : বিগত বছরের অন্যতম সফলতা হলো পরীক্ষামূলকভাবে থ্রিজি চালু করা। সরকারি মোবাইল অপারেটর টেলিটক পরীক্ষামূলকভাবে থ্রিজি চালু করার ফলে ঢাকা ও তার আশপাশে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। যদিও এই সীমিত ব্যবহার আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে না, তবুও এটি এক ধরনের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। থ্রিজির বিষয়টি ব্যর্থতা হিসেবেও দেখা উচিত। কারণ ২০০৯ সাল থেকে এই প্রযুক্তি আসার কথা থাকলেও ২০১২ সালেও এই প্রযুক্তি উন্মুক্ত হয়নি। এর ফলে দেশ প্রায় হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে। একই সাথে দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ বাড়ার ফলে যে জাতীয় প্রবৃদ্ধি হতে পারত, তা হয়নি। এ বিষয়ে টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়কে চরম ব্যর্থ বলে সরাসরি চিহ্নিত করা যায়। বিটিআরসি কর্তৃপক্ষও পুরো বিষয়টিতে ধীরে চলো নীতিতে এগিয়েছে বলে জাতির এত বড় একটি ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এখনও আমরা ফিঙ্গার ক্রস করে রাখছি এই জানুয়ারিতে থ্রিজির নিলাম হবে এবং ২০১৩ সালে পুরো দেশ থ্রিজি প্রযুক্তি পাবে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি : ২০১২ সালে বড় একটি মাইলফলক ঘটনা ঘটেছে ষষ্ঠ শ্রেণিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার শুভ সূচনার মাধ্যমে। এ বছর থেকে এই শ্রেণিতে পাঠরত সব শিক্ষার্থী ৫০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি পাঠ করছে। একই সময় সপ্তম শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে এবং ২০১৩ সালে এটিও বাধ্যতামূলক হতে যাচ্ছে। প্রস্তাবনা ছিল ২০১৩ সালে অষ্টম-নবম-দশম শ্রেণিতেও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়টি বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু ব্যর্থতা হলো সেই কাজটি সম্পন্ন হয়নি। জাতীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যক্রম বোর্ড আরও দুটি বই লেখাতে পারেনি বা প্রকাশ করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, এ কথাগুলো বলা প্রয়োজন। এই বছরে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ল্যাব গড়ে তোলার কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কমপিউটার ল্যাব গড়ে তোলার মূল পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এরা এখন আর কমপিউটার ল্যাব গড়তে চায় না, বরং ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়তে চায়। এজন্য ২০ হাজার ৫০০ স্কুলে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য এরচেয়ে বড় কোনো প্রকল্প এর আগে আর কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সরকারের এই প্রকল্প নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে। ক্লাসরুমে প্রজেক্টর দেয়ার কারিগরি বিষয়ের পাশাপাশি বড় প্রশ্ন হচ্ছে– প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ দিয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ার জন্য কনটেন্ট কোথায়? গত বছরে সরকার অনেক শিক্ষককে পাওয়ার পয়েন্ট শিখিয়েছে। এটি নিশ্চয়ই ভালো কাজ। কিন্তু এটি তারা ভাবেনি, পেশাদারদের ছাড়া ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা সম্ভব নয়। সরকারের একটি মহল মনে করে, শিক্ষকেরাই কনটেন্ট তৈরি করে শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে পারবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পেশাদার মানের কনটেন্ট ছাড়া শিক্ষাকে ডিজিটাল করা যাবে না।

বিগত বছরে বেসরকারি খাতের একটি বড় অর্জন ছিল শিশু শ্রেণির শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করতে পারা। বিজয় ডিজিটাল দু'টি সফটওয়্যার ও ৬টি বইয়ের সহায়তায় শিশু শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করতে সক্ষম হয়েছে। নতুন পাঠক্রম প্রণীত হওয়ার ফলে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে ২০১২ সালে প্রচলিত সফটওয়্যারগুলো ২০১৩ সালে পাঠ্য থাকবে না বলে কিছুটা পশ্চাৎগতি আমরা দেখেছি। কিন্তু আশা করা হচ্ছে, ২০১৩ সালে এই সঙ্কট দূর হবে। এ বছরেই পাঠক্রমের নতুন সফটওয়্যার অন্তত প্রাথমকি শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ডিজিটাল যশোর ও ডিজিটাল সরকার : ২০১২ সালের একটি বড় অর্জন হলো যশোর জেলাকে ডিজিটাল হিসেবে ঘোষণা করা। এ কার্যক্রমের আওতায় জেলার সব অফিসে ডিজিটাল প্রশাসন চালু করা হয়েছে। কাগজের ফাইলের বদলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করা ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণকে সেবা দানের যে জয়যাত্রা যশোরে শুরু হয়েছে, তা ২০১৩ সালে সব জেলাতে চালু হবে বলে আশা করা যায়। তবে ব্যর্থতা হলো, বাংলাদেশ সচিবালয়ে যশোরের কোনো আদলই কোনো মন্ত্রণালয়ে চালু করা যায়নি। ২০১২ সালে জনগণের গোড়ায় সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সেবাগুলোকে ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রগুলোর সঙ্কটও কিছুটা কমে গেছে। এই কেন্দ্রগুলো থেকে আয় বেড়েছে। অচল বা নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রের সংখ্যাও কমেছে। সরকারি ওয়েবসাইটের সংখ্যা বেড়েছে। সরকার ২০১২ সালে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড নামে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে দেশের অগ্রগতি তুলে ধরেছে। সরকারের পক্ষ থেকে পবিত্র কোরানের ডিজিটাল সংস্করণও প্রকাশ করা হয়েছে।

সফটওয়্যার, সেবা ও আউটসোর্সিং : ২০১২ সালে সফটওয়্যার ও সেবা খাতে অফিসিয়াল রফতানি আয় বেড়েছে শতকরা ৫৪ ভাগ। আউটসোর্সিং খাতের আয়ও প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে। বাংলাদেশের তরুণেরা বিশ্বজুড়ে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। মোবাইলের অ্যাপ তৈরি থেকে শুরু করে ডাটা এন্ট্রি পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই এই তরুণদের সফলতা গর্ব করার মতো। দেশের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোও তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তবে খুব উল্লেখযোগ্য কোনো কিলার অ্যাপ ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়নি। বরং ▸

দেশের বাজারে বিদেশি সফটওয়্যারের আগমন অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে বিদেশীদের প্রাধান্য চোখে পড়ার মতো ছিল।

আমরা যদি সফলতাগুলোর পাশাপাশি ব্যর্থতার কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করি, তবে বেশ কয়েকটি বড় বিষয়ের প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। এর আগেই সফলতার কথা বলতে গিয়ে আমরা থ্রিজি চালুতে সরকারের ব্যর্থতার কথা বলেছি। ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের ব্যর্থতার কথা বলেছি। সরকার যে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কোনো ধরনের ডিজিটাল রূপান্তর করতে পারেনি সে কথা আমরা স্পষ্ট করেই বলেছি। এমনকি ডিজিটাল ক্লাসরুম চালুতে সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের কথাও বলেছি। এর বাইরেও ২০১২ সালে সরকারের যে কয়টি ব্যর্থতা আমাদেরকে পীড়া দিয়েছে, তার কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই।

তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা নবায়নে ব্যর্থতা : এই সরকারের একটি বড় সফলতা ছিল ২০০৯ সালের শুরুতেই ক্ষমতাসীন হওয়ার ১০০ দিনের মধ্যে একটি তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা। ২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীতিমালাটিকেই একটু অদল-বদল করে গ্রহণ করা হয়েছিল। এরপর নীতিমালাটি নবায়ন করার জন্য ২০১১ সালে উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু ২০১২ সালের পুরোটা সময় অতিক্রম করেও নীতিমালাটির নবায়ন করা সম্ভব হয়নি। থ্রিজি চালু না করার ক্ষেত্রে যেমন আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা দায়ী, তেমনি নীতিমালা আপডেট করার ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্রই দায়ী। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতাকেও উপেক্ষা করা যাবে না। মন্ত্রীরা এই বিষয়ে আরও সচেতন হলে এসব ব্যর্থতা হতো না।

স্থবির আইসিটি মন্ত্রণালয় ও সমন্বয়হীনতা : ২০১২ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বলতে গেলে নিষ্ক্রিয় ছিল। প্রথমে এর অবকাঠামোগত সমস্যা ছিল। পরে সেসব সমস্যা কেটে গেলেও মন্ত্রণালয়টি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এজন্য সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাইটেক পার্ক এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। এটুআইয়ের সাথে জটিলতা ছাড়াও মন্ত্রণালয়, কমপিউটার কাউন্সিল ও হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ একাট্টা হয়ে পুরো বছর কাজ করেনি। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা এই মন্ত্রণালয় পালন করতে পারেনি।

অভাগা বাংলা ভাষা : আশা করা হয়েছিল, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ২০১২ সালে কিছুটা হলেও সরকারের সহযোগিতা পাবে। বিশেষ করে সরকার যখন বাংলা কিপ্যাড ছাড়া মোবাইল ফোন আমদানি নিষিদ্ধ করে তখন আশাটা একটু বড় হতেই পারে। সেজন্যই বাংলা বানান শুদ্ধিকরণ, বাংলা ওসিআর, বাংলা টেক্সট টু স্পিচ, বাংলা স্পিচ টু টেক্সট তৈরি হবে এমন আশা ছিল। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল তেমন কাজ করবে বলে সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। কিন্তু বছর শেষ হওয়ার পরও এ বিষয়ে সামান্যতম অগ্রগতি হয়নি। সরকার ২০১২ সালে বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে একটি বাংলা ফন্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেও এসব প্রযুক্তিগত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

নতুন বছর যখন শুরু হলো তখন পুরো জাতির মতোই আমাদের প্রত্যাশা– সরকার তার মেয়াদের শেষ বছরে সব দুর্বলতা কাটিয়ে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছবে কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com